ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 98- 102
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.184

চন্দন সেনের নির্বাচিত নাটকে প্রতিবাদী নারী চরিত্র

জয়ন্তী রাজোয়াড়, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 10.09.2025; Accepted: 22.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author (s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Playwright Chandan Sen's plays have highlighted various problems in society. He has shown his skill in portraying social sense. Along with various scenes of society, the life of women has been perfectly portrayed in his plays. As he has talked about the struggle of women, he has also highlighted the self-respect and individual freedom of women. He has attacked the norms of patriarchal society. Women will always be manipulated and used according to the will of men. He has broken this idea in his play 'Karnabati', 'andhagali', 'jahanara jahanara' etc. The protesting voice of women can be heard in these plays of his.

Keywords: Patriarchy Society, Women Disrespect, Self-respect, Protest, Self-confidence, Hurt pride, Relationship breakdown, Offended state of mind

নাট্যকার চন্দন সেন ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশের বরিশালে জন্মগ্রহণ। দেশভাগের সময় তাঁরা সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এপার বাংলাতেই তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। রাজনীতি ও শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি নাটক লেখায় মনোনিবেশ করেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে কখনও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। এই প্রভাব তাঁর লেখার মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবে লক্ষ করা যায়। নাটকে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিও অন্যায়ের সাথে আপস না করে তার বিরোধিতা করেছে। পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি নাট্যকার চন্দন সেনের নাটকে নারী চরিত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি শুধু নারীর জীবনযন্ত্রণার কথা তুলে ধরেননি। নারীকে সেই পঙ্কিলময় জীবন থেকে মুক্তির পথে পরিচালিত করেছেন। নারী যে পুরুষের কুক্ষিগত সম্পদ নয় সেই চিত্র তাঁর বিভিন্ন নাটকের মধ্যে দেখতে পাই। বহু বছর ধরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা মূক ও বধিরের ন্যায় অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করে জীবনযাপন করে আসছে। শত যন্ত্রণা সহ্য করেও তারা পুরুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেনি, রুখে দাঁড়াতে পারেনি সেই গতানুগতিক সমাজব্যবস্থার উপর। তারা মান-সম্মান ছাড়াই পুরুষের সঙ্গে অসহায় অবলা নারী হয়ে সংসার করে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। নাট্যকার চন্দন সেন তাঁর নাটকে অবলা নারী নয়, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীর প্রতিবাদী রূপটি তুলে ধরেছেন। এই নারীরা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যকে অস্বীকার করে নিজস্ব মত এবং জীবনযাত্রার পথকে বেছে নিয়েছে। নাট্যকার চন্দন সেনের 'কর্ণাবতী', 'অন্ধগলি', 'বিয়েগাউনি কাঁদনচাপা' প্রভৃতি নাটকে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং প্রতিবাদী ভাবমূর্তি প্রকাশিত হয়েছে।

আমার আলোচ্য 'কর্ণাবতী' নাটকের প্রধান চরিত্র কুসুম্বী বা কুসুম। এই কুসুম নন্দা ও সূরজ পরিহারের মেয়ে। নিজের স্বার্থে সূরজ মেয়ে কুসুমকে মাওলীর জোতদার কৈলাশ রাওয়াতের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়। কারণ কৈলাশ নিঃসন্তান এবং সম্প্রতি তার বউ মারা গেছে এই সুযোগে কুসুমের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সূরজ জাতে উঠতে চায়। কুসুমের বাবা অর্থের লোভে কমবয়সী মেয়েকে বৃদ্ধ জোতদারের হাতে তুলে দেয়। সূরজের হাতে নগদ দশ হাজার টাকা দিয়ে কৈলাশ রাওয়াত কুসুমকে বিয়ে করে। বিয়ের প্রথম থেকে কৈলাশ ও কুসুমের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। কৈলাশ

কুসুমের আচার ব্যবহার ও কথাবার্তায় রাগান্বিত হলেও বেশিরভাগ আবদারই পূরণ করে। কিন্তু কুসুম স্বামীর বাঈজীর বাড়ি যাওয়া আর বাড়ির ঝি মল্লির সাথে অবৈধ সম্পর্ককে মেনে নিতে পারেনি। কৈলাশ কুসুমের ভালোলাগা বা মন্দলাগার কোনো ধার ধারেনি। তাই কুসুমকে উপেক্ষা করে দিসরাগড়ে বাঈজীর বাড়িতে চলে যায়। এদিকে ভীমপুরের মেলায় রাজপুত চোড়িওয়ালা ব্রিজমোহনের সাথে কুসুমের পরিচয় হয়। তাদের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা বাড়তে থাকে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে কুসুম একদিন ব্রিজমোহনের সঙ্গে পালিয়ে যায়। সূরজ ও কৈলাশ তাকে বাড়ি ফেরানোর শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। সূরজ তাকে সমাজের মান-সম্মানের কথা মনে করিয়ে দেয়।

> "সূরজ।। (অধৈর্য) অনেক হয়েছে— চ বাড়ি ফিরে চল বলছি—ছিঃ ছিঃ তোর লাজ হচ্ছে না লোক হাসাতে!
>
> কুসুম্বী।। না বাপু হচ্ছে না—লাজও হচ্ছে না, ভয়ও হচ্ছে না—আমি এখানেই থাকবো।"[১]

বাবার ইচ্ছেতে বিয়ে করলেও কুসুম আজ বাবার ইচ্ছাকে অস্বীকার করে নিজের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়েছে। খালি হাতে ফিরে যেতে হয় মাওলির প্রতাপী জোতদার কৈলাশ রাওয়াতকে। কুসুমের এই সিদ্ধান্তে পিতা সূরজ খুশি না হলেও মা নন্দা খুশি হয়েছে। কারণ গরিব ঘরের মেয়ে হয়ে গ্রামের জোতদারকে পরিত্যাগ করায় কৈলাশ রাওয়াতের অহংকার ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

> "নন্দা।। তোমার আমার জীবনতো শেষ হয়ে এল কুসুম্বীর বাপু—এরকম রাতদিন ভয়ে ভয়ে, পয়সাওয়ালার লাথি খেয়ে—বড় মানুষের কাছে মাথা নিচু করে, ভিখ মেগে—আর না হয় ঘরের ইমান বেচে বাইরের মান নাই কিনলে। মেয়ে যদি মাথা উঁচু করে নিজের খেয়ালে বাঁচতে পারে তো বাঁচুক না—"[২]

ব্রিজমোহনের সঙ্গে নতুনভাবে কুসুম সংসার শুরু করে। কিন্তু এই সুখ কুসুমের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিছুদিন পর অন্তঃসত্ত্বা কুসুম জানতে পারে ব্রিজমোহনের গ্রামের বাড়িতে স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। এই কথা জানতে পেরে কুসুম্বী মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। যার জন্য সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে সাথে লড়াই করেছিল সেই মানুষটা তাকে মিথ্যে কথা বলে ঠকিয়েছে। ব্রিজমোহনের এই বিশ্বাসঘাতকতা কুসুম মেনে নিতে পারেনি। অসুস্থ সন্তানকে দেখতে যাওয়ার জন্য ব্রিজমোহন দেশের বাড়িতে যায়। এই সুযোগে অন্তঃসত্ত্বা কুসুম ব্রিজমোহনের সংসার ত্যাগ করে বাপের বাড়িতে চলে আসে। সূরজ বিবাহিত অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে বাড়িতে আশ্রয় দিতে চায়নি। স্বামীর ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। কুসুম সমস্ত অভিযোগ-অনুরোধ উপেক্ষা করে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

নাটকের অন্তিম পর্যায়ে দেখি, ব্রিজমোহন এবং কৈলাশ দুজনেই কুসুমকে বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছে। কুসুম কিন্তু কারো সঙ্গে যেতে রাজি নয়। প্রথমে ব্রিজমোহনকে স্বামী এবং গর্ভের সন্তানের পিতা হিসেবে অস্বীকার করলে ব্রিজমোহন বাড়ি ফিরে যায়। এই সুযোগে কৈলাশ কুসুমের সব দোষ ক্ষমা করে বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু কুসুম কৈলাশ রাওয়াতকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে, এই গর্ভের সন্তান কৈলাশেরও নয়। এই কথা শুনে কৈলাশ জানায়—

> "কৈলাশ।। ব্রিজমোহনের নয়—আমার নয় তাহলে ওটা কার কুসুম? দুনিয়ার লোককে কি বলবে—সবাই যখন জানতে চাইবে— কি বলবে? এই বাচ্চা বাকদোলা বাচ্চা, জারজ— ওর বাপ নেই?
>
> কুসুম।। না। বলবো এটা আমার বাচ্চা। আমি ওর বাপ—আমি ওর মা। আমার কোনও মরদ নেই—মেলে নি—সাচ্চা মরদ আমি দেখি নি।"[৩]

আমাদের চিরাচরিত সমাজ কাঠামোতে যেমন স্বামীর মধ্য দিয়ে স্ত্রী পরিচিত। তেমনি পিতার মধ্য দিয়ে সন্তানের পরিচিতি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পিতার পরিচয়হীন সন্তানকে জারজ সন্তান বলা হয়। নারী যে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় তা এই সংলাপে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। সমাজে দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা রীতি-নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে কুসুম তার নিজস্বতাকে ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে নিজস্ব সত্তাকে স্বতন্ত্র করে জীবনযাত্রার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

'বিয়েগাউনি কাঁদনচাপা' নাটকে মুসলিম সম্প্রদায়ের নারীর জীবনযন্ত্রণার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বিয়ের গান গাওয়ার দল রয়েছে। এই দল মুসলমান সম্প্রদায়ের বিয়ে এবং মারা যাওয়ার সময় কাঁদন গীতি গেয়ে থাকে। তাদের গানের মধ্যে শুধুমাত্র মুসলমান সমাজের সুখ দুঃখের কথা প্রকাশিত হয় না সমগ্র সমাজের নানান সমস্যার কথা উঠে আসে। এই দলের নারীরা বেশিরভাগই স্বামীহারা অথবা স্বামীছাড়া। সমাজের এই

নারীরা স্বামীর কাছে অবহেলিত, নির্যাতিত ও বঞ্চিত হয়ে শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করে গান গেয়ে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে থাকে।

নাটকের প্রথমে আমরা গোলবিবির কথা জানতে পারি। চার সতীন ও স্বামীর দ্বারা পীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত হয়ে বাড়ি ছেড়েছিল। গোলবিবি গান বেঁধে, গানের দল তৈরি করে এখন স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে। বর্তমানে নিজের রোজগারের টাকায় স্বামীকেও দেখাশোনা করে। কারণ চার সতীন মিলে জমি জায়গা, টাকা-পয়সার দখল নিয়ে স্বামীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। এই খবর পেয়ে অসহায় স্বামীকে আশ্রয় দিয়েছে গোলবিবি। কিন্তু গানের মধ্য দিয়েই গোলবিবি নিজস্ব মুক্তি খুঁজে বেড়ায়। এই গান তাদের হয়ে উঠেছে সুখ দুঃখ প্রকাশের মাধ্যম।

নাটকের দ্বিতীয় অন্যতম প্রধান চরিত্র ফেলনাবিবি। ফেলনাবিবির মা সারাজীবন দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে। তার মায়ের স্বামীর অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করেই জীবন কেটেছে। ফেলনাবিবির মায়ের কোনোদিন স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস হয়নি। সেই অসহায় মায়ের মেয়ে ফেলনাবিবি কিন্তু স্বামীকে ভয় পায় না। স্বামীর হুঙ্কারের জবাব যে মন দেয়, তেমনি অবাধ্য স্বামীকে মারতেও দ্বিধাবোধ করেনি। স্বামীর ভরসায় না থেকে নিজে গান গেয়ে সংসারের দেখাশোনা করে। ফেলনাবিবি বলে—

> "জেবন এখন আমারে গোক্ষুরের মতো ফোঁস করতি শিখায়েছে।"[৪]

নাটকের তৃতীয় প্রধান নারী চরিত্র বর্ধমান জেলার বিরুলি গ্রামের ওলেমাবিবির জীবনেও একই ঘটনা দেখতে পাই। চার বছর স্বামীর সংসার করেছিল। স্বামী ছাড়াও তাদের ভাইদের কাছে শারীরিক শোষণ ও নির্যাতন সহ্য করতে হতো। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে স্বামী-সন্তান ত্যাগ করে। অতীতের যন্ত্রণাময় জীবন পরিত্যাগ করে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন শুরু করে। ওলেমাবিবির সংলাপে জানতে পারি—

> "আমি এখুন নিজের দল গড়িছি। লতুন করে বাঁচার পথ পেয়ে গেছি বুবুজান। নোকে ধন্যি ধন্যি করে। খেয়ে-মেখে বেঁচে তো আছি বুবু, শরীল দিতি হয় না কারুক্কে, দশ-বিশ গাঁয়ের মানুষ কদর করি বায়না দেয়। আমি তো জানি নাই একদিন ঢোল বগলে লিয়ি ই-দ্যাশ উ-দ্যাশ ঘুরি আমার লিজেরে একটো নাম হবে। এখুন আমি সত্যিই শেখ, শেখ ওলেমা।"[৫]

উল্লেখিত মুসলিম সমাজের নারীদের জীবন ছিল দুঃখ যন্ত্রণায় ভরা। বঞ্চনা, লাঞ্ছনা এবং অপমান সহ্য করতে না পেরে স্বামীর ছত্রছায়া পরিত্যাগ করে স্বাধীনভাবে বাঁচার পথ খুঁজে নিয়েছে।

'অন্ধগলি' নাটকের অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র রণিতা ও নীলাঞ্জনা। এই দুটি নারী চরিত্রের মধ্যে প্রতিবাদী ভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। এই নাটকের মূল পুরুষ চরিত্র সৌম্য। এই সৌম্যের পূর্বপত্নী রণিতা এবং বর্তমান নীলাঞ্জনা। সৌম্য তার বাবার মৃত্যুর পর জানতে পারে সমস্ত গচ্ছিত সম্পদ বাবার উপপত্নীর নামে রয়েছে। বাবার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ও নিঃস্ব হয়ে নতুনভাবে প্রজেক্ট শুরু করতে চায়। এই কাজের জন্য স্ত্রী রণিতাকে মডার্ণ সভ্যতা ও পরপুরুষের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। নিজের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে সৌম্য তার স্ত্রী রণিতার মডার্ণ জীবনযাপন নিয়ে কটাক্ষ ও বিরোধিতা করতে শুরু করে। তার বাড়িতে থাকতে হলে তার ইচ্ছানুযায়ী চলতে হবে। সৌম্য এই কথা রণিতাকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়। রণিতা স্বামীর এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে জানায়—

> "…. যখন ঘরের বৌ'কে নিজের প্রয়োজনে— তোমার এই পরিবারের প্রয়োজনে বাইরের কাজে নামিয়েছিলে তখন খেয়াল রাখা উচিত ছিল নীচে নামার গভীরতা কতটা হতে পারে। আমার এই নতুন Life Style দিকে একদিন তুমিই আমাকে ঠেলে দিয়েছিলে তোমারইম স্বার্থে— আজ সেই আলু ভাতে মার্কা শান্ত লক্ষ্মী পেঁচা বৌটাকে ফিরে চাও কোন অধিকারে? Mercy যে নেয় তার আধিপত্য দেখাবার কোন অধিকার থাকে কি?"[৬]

এই মতবিরোধের ফলে তারা দুজনে আলাদা হয়ে যায়। রণিতা সন্তানকে নিয়ে বাকি জীবন কাটাতে চাইলেও সৌম্য কিন্তু আবার বিয়ে করেছে। এ বিয়েটা ছিল রণিতার কাছে জেতার জন্য। আর এই স্বামী-স্ত্রীর হার-জিতের লড়াইয়ের মাঝে নীলাঞ্জনা এসে পড়ে।

নীলাঞ্জনা ছিল সাধারণ মেয়ে। অসুস্থ মা ও ভাইকে নিয়ে তার সংসার। তার দাদা তাদের খোঁজখবর নেয় না। নীলা সংসার চালানোর জন্য একটা কোম্পানিতে কাজ করে। এই কোম্পানিতে টিকে থাকতে নীলাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার

করতে হয়েছে। তবু পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। কোম্পানির ভাইস-এর সাথে তাকে আপস করতে হয়েছে। নীলার দাদাও নিজের স্বার্থের জন্য ডিভোর্সি ও বয়স্ক পাত্র সৌম্যের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছে। মা ও ভাইয়ের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে নীলা এই বিয়েতে রাজি হয়ে যায়। বিয়ের পর নীলা সৌম্যের আদর্শ স্ত্রী হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। স্বামী ও সংসার যা পেয়েছে তাই নিয়ে খুশি মনে বাকি জীবনটা ভালোভাবে কাটাতে চায়। বিয়ের পর সৌম্য স্ত্রী নীলাকে চোখে চোখে রাখতো। নীলার বিশ্বাস ছিল স্বামী তাকে ভালোবাসে। কিন্তু নীলার এই বিশ্বাস শেষে ভেঙে যায়। তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের আসল রহস্য সামনে আসে।

> "নীলা।। তার মানে এক মুহূর্তে আমায় তোমার চোখের আড়াল হতে না দেওয়া.... সারাক্ষণ আগলে রাখা— এগুলো-এগুলো তোমার আমার প্রতি—ভালোবাসা নয়—কেবল তোমার জয়ের জন্য?"[৭]

সৌম্য তার প্রাক্তন স্ত্রী রণিতাকে হারানোর জন্য নীলাকে মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগিয়েছে। তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে আবেগ, প্রেম, ভালবাসা, সহানুভূতি কিছুই ছিল না যা ছিল তা শুধুমাত্র মিথ্যে ছলনা। সম্পর্কের এই সত্যতা জানতে পেরে নীলা ভেঙে পড়েছে। সৌম্য নিজের ভুল বুঝতে পেরে নতুন করে বাঁচার ও পথ চলার একটা সুযোগ চেয়েছে নীলার কাছে। নীলা কিন্তু সৌম্যের সাথে বাড়ি ফেরেনি। রণিতা এবং নীলাঞ্জনা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এই দুই নারী স্বামীর অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই নারী পুরুষের অসীম প্রভাব প্রতিপত্তির বশবর্তী নয়। তারা আত্মসম্মানের কাঙ্ক্ষিত। আর যখনই নারীর এই আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে তখনই সেখান থেকে তারা খুব স্বাভাবিকভাবে সরে পড়েছে। উল্লেখিত নাটকেও আমরা সেই চিত্র দেখতে পাই।

'জাহানারা জাহানারা' নাটকে দারিদ্র্যতা ও জাতপাতের ভেদাভেদের লড়াইয়ের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এই নাটকের প্রধান চরিত্র জাহানারা কিংবা জুলি। জুলির বাবা কাসেম আলি ভালোবেসে বিয়ে করেছিল ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়েকে। জুলির জন্মের পর তার মা স্বামী কাসেম আলিকে ত্যাগ করে। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে জুলির বাবা আত্মহত্যা করে। বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে জুলি বেরিয়ে পড়ে। তার অনিশ্চিতের জীবনে এক জীবনসঙ্গী আসে। বিয়ের কিছুদিন পরে অন্তঃসত্ত্বা জুলিকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। এখন তার জীবন কাটে রাতের বেলা জাহানারা হয়ে নিষিদ্ধ পল্লিতে আর দিনের বেলা জুঁই হয়ে ব্রাহ্মণের বাড়িতে। ব্রাহ্মণের বাড়িতে বামুনের মেয়ে হয়ে জুলি (কাজের মেয়ে। তাদের ঘরে ঢুকে বাবার অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছে। অপরদিকে মেয়েকে ভালোভাবে মানুষ করার জন্য একাই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। নিজের জীবনের সর্ব্বস্ব দিয়ে মেয়ে বিনিকে এই নোংরা পরিবেশ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে। সমাজের নারী মাংসলোভী পুরুষেরা জুলির মেয়ে বিনিকে ভোগ করার জন্য তুলে নিয়ে যায়। এই দলের প্রধান বুল্টনের উদ্দেশ্য ছিল বিনির শরীর ভোগ করে বাইরে পাচার করে দেওয়া। কিন্তু এই মনস্কামনা তার পূর্ণ হয়নি তার আগেই বাঘিনীর ন্যায় বুল্টনের উপর ঝাপিয়ে পড়ে জুলি। জুলির শাবলের আঘাতে বুল্টনের মৃত্যু হয়।

জুলির বাবা জীবনযুদ্ধে হেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। জুলি কিন্তু এই ভুলটা করেনি। দারিদ্র্যতার কাছে মান-সম্মান বিসর্জন দিয়েও আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়নি। জীবন সংগ্রামে সে জিতে গেছে। এই নাটকে নাট্যকার চন্দন সেন সমস্ত নারী জাতিকে অসীম মনোবলের অধিকারী হওয়ার বার্তা দিয়েছেন।

নাট্যকার চন্দন সেনের 'বারুদ বালিকা' এবং 'অভিমন্যুর খোঁজে' এই নাটক দুটিতে সম্পর্কের ভাঙন ও নারীর আত্মমর্যাদাবোধের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। 'বারুদ বালিকা' নাটকে স্কুল মাস্টারের ধর্ষিতা কন্যা দোলন। সমাজের মানুষ ধর্ষিতার হয়ে বড়ো বড়ো কথা বললেও কেউ কোনোদিন ধর্ষিতা মেয়েকে সম্মানের চোখে দেখেনি কিংবা নিজের জীবনসঙ্গিনী করতে পারেনি। যেমনটা হয়েছে দোলনের সঙ্গে। মন্ত্রী তন্ময় রায়ের প্রেমিকা ছিল দোলন। তারা পার্টিকর্মী ছিল। এই সময় দোলন ধর্ষিত হয়। তন্ময় তার সাথে এই পাশবিক অত্যাচারের তীব্র বিরোধিতা করেছিল এবং দোলনের পাশে থাকার কথা বলেছিল। কিন্তু এই মেয়েকে স্ত্রী করার সাহস তার ছিল না। কারণ দোলনের মতো মেয়েদের জন্য মানুষের দীর্ঘশ্বাস ও সহানুভূতি থাকলেও বাস্তবে তা মেনে নেওয়া যায় না। তাই তন্ময় গোপনে দোলনের কাছ থেকে পালিয়ে যায়। সে অন্য মেয়েকে বিয়ে করে সুখী সংসারজীবন কাটাচ্ছে। কিন্তু তন্ময়ের এই বিশ্বাসঘাতকতায় দোলন আজও সমাজের অন্যান্য পুরুষ মানুষকে বিশ্বাসের চোখে দেখতে পারেনি। এই নাটকে তন্ময়ের কাপুরুষতার তীব্র নিন্দা করেছে দোলন।

> "...মহাকালের খাতায় একটা সামান্য জ্যামিতিক বিন্দু হয়েই আমাদের থাকতে হয়, সেভাবেই থাকতে দাও। গাছের শুকনো ছেঁড়া পাতা যেভাবে জানালা দিয়ে হঠাৎ কোনো রাজমহলে ঢুকে পড়ে, জোনাকির ভীরু আলো যেমন করে হঠাৎ এক সর্বনাশা কৌতুকে আঁধার রাতের পথিককে পথ দেখাতে চায়, তেমনি—তেমনি করেই আমি এসেছিলাম, চলেও যাচ্ছি। এই আসা আর যাওয়ায় পৃথিবীর কারোর কোনো ক্ষতি হবে না; তবু তুমি যে এত বড় মন্ত্রী হয়েও এত জনপ্রিয়, একটা মানুষ হয়েও একটা অখ্যাত অবজ্ঞেয় ধর্ষিতার জন্য একটু কেঁদে উঠলে, গলাটা যে হঠাৎ তোমার বহুদিন পর একটু ভারি হয়ে উঠল—এটাই তো আমার লাভ...এটাই তো আমার অনেক পাওয়া।"[৮]

তন্ময় নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপ ও হতাশায় ভেঙে পড়েছে। তাই বারবার দোলনকে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। কিন্তু দোলনকে যেভাবে উপেক্ষিত হতে হয়েছিল সেভাবেই আজকে তন্ময়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে উপেক্ষা করেছে।

'অভিমন্যুর খোঁজে' নাটকে অভাগী আহ্লাদী ভালোবেসেছিল তার শান্তদাকে। এই শান্তদা সারাজীবন আহ্লাদীর সঙ্গে কাটাতে চেয়েছিল। কিন্তু আহ্লাদী তাদের বাড়ির ঝি ছিল। যখন বিয়ের সম্বন্ধ এলো শান্তদা এককথায় রাজি হয়ে গেল। সেদিন আহ্লাদীর জন্য পরিবারের কাছে প্রতিবাদ করতে পারেনি। পরিবারের কাছে আবেদন করেছিল তার বিয়ের আগে যেনো আহ্লাদীর বিয়ে দেওয়া হয়। শান্তদাকে নিয়ে আহ্লাদীর ধারণা ছিল অর্জুন পুত্রের অভিমন্যুর মতো পরিবারের সাথে লড়াই করে আহ্লাদীকে নিজের করে নেবে। এই স্বপ্ন তার চিরতরে ভঙ্গ হয়ে যায়। আহ্লাদী নিরুদ্দেশের পথিক হয়ে সত্যিকারের অভিমন্যুর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

উল্লেখিত নাটকগুলিতে নাট্যকার চন্দন সেন নারী জীবনের অসহায় জীবনযন্ত্রণার কথা যেমন তুলে ধরেছেন। তেমনি নারীর প্রতিবাদী রূপটিও উন্মোচিত করেছেন। তাঁর নাটকে নারী হয়ে উঠেছে অসীম মনোবলের অধিকারী। তারা জীবনের কঠিন থেকে কঠিনতম পরিস্থিতিতেও ভেঙে পড়ে না। জীবনযুদ্ধে লড়াই করার সাহস রাখে। যে মানুষটির কাছে তারা অবহেলিত বঞ্চিত হয়েছে সেই মানুষটির কাছে তারা দ্বিতীয়বার যায়নি এবং সেই মানুষটাকে দ্বিতীয়বার তার জীবনে আসার সুযোগও দেয়নি। যেমন কুসুম, রণিতা, নীলা, দোলন কিংবা আহ্লাদী। তারা সবাই পুরুষদের উপেক্ষা ক্রুরে গতানুগতিক পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরোধিতা করেছে। পুরুষের অবমাননা, লাঞ্ছনা সহ্য করে ভাগ্যকে বিধাতার হাতে ছেড়ে দেয়নি। নিজেদের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি। তারা কখনও সর্বসমক্ষে কখনও আবার নিঃশব্দে প্রতিবাদ করে সেই পুরুষের কাছ থেকে বহুদূরে চলে গেছে। নাট্যকার চন্দন সেনের সৃষ্ট আত্মাভিমানী নারী চরিত্রগুলি অপ্রীতিকর সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মসম্মানকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই বঞ্চিত নারী দুর্বলের ন্যায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়নি কিংবা পুরুষের কাছে অনুনয় বিনয়ের মধ্য দিয়ে আপস করেনি। তারা গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত জীবন থেকে দূরে সরে গেছে। অর্থাৎ নাট্যকার চন্দন সেন তাঁর নাটকে শুধু নারী জীবনের সমস্যার কথা অঙ্কন করেননি সেই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের পথনির্দেশেও দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১। সেন, চন্দন। কর্ণাবতী: অন্ধগলি। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪১১, কলকাতা, পৃ. ৪১।
২। তদেব, পৃ. ৫৩।
৩। তদেব পৃ. ৭৫।
৪। সেন, চন্দন। পপুলার পাঁচ নাটক। দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০২০, কলকাতা, পৃ. ২৮।
৫। তদেব, পৃ. ৩৭।
৬। সেন, চন্দন। কর্ণাবতী: অন্ধগলি। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪১১, কলকাতা, পৃ. ১২৩।
৭। তদেব, পৃ. ১৩৬।
৮। সেন, চন্দন। শ্রুতি নাটক সমগ্র। মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২৪, কলকাতা, পৃ. ৫১।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। সেন, চন্দন। পপুলার পাঁচ নাটক। দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০২০, কলকাতা।
২। সেন, চন্দন। কর্ণাবতী : অন্ধগলি। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৪১১, কলকাতা।
৩। সেন, চন্দন। শ্রুতি নাটক সমগ্র। মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২৪, কলকাতা।